কবির চোখে কবি

– বিরাম মুখোপাধ্যায়

–মতি মুখোপাধ্যায়

'ঘরানা' নামে বহুল প্রচারিত শব্দটি প্রাচীন। মূলত সেটি গানবাজনার সম্পর্কিত হলেও সাহিত্যেও প্রযুক্ত হতে পারে। সে কথাটির সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে হরিহর আত্মার মতন 'মূল্যবোধ' শব্দটি উঁকিঝুঁকি দেয়। আসলে কি সাহিত্যে কি শিল্পে সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। কোনো নির্দিষ্ট জ্যামিতিক রেখায় তার গতিপথ নির্দেশ করা যায় না। সে চলে নিজস্ব নিয়মে। অবশ্যই পারিপার্শ্বিকের একটা প্রভাব তাকে ছুঁয়ে যায়। প্রায় সব নদী কোনো না কোনো সময়ে তার সাবেকি গতিপথ পালটে নেয়। গঙ্গা পদ্মা তিতাসের মতো নদী তার গতিপথে নগর-সভ্যতার নতুন বিন্যাস সূচনা করে। রবীন্দ্রনাথ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা অদ্বৈত মল্লবর্মনের অমর সৃষ্টি গড়ে ওঠে। সেখানেই ধ্রুপদি শিল্প-সাহিত্য বা ঘরানার উৎপত্তি। বলাবাহুল্য তা কালজয়ী হয়ে ওঠে তার প্রবল প্রাণশক্তিতে। ইদানীং (অপ) প্রচারের দৌলতে 'এরন্ড' 'মহীরুহ আকার পাচ্ছে। ঘরানার ক্লাসিক পিছিয়ে পড়ছে ঝাঁ-চকচক বিলাস বিপনি বা 'মলের' প্রতিযোগিতায়। বাণিজ্যিক বাজার মহিমায় অসার ও অযোগ্য সাহিত্য 'বেস্ট সেলারের' তকমা পরে নিচ্ছে। সেই সঙ্গে যা প্রয়োজন ছিল সেই তিরস্কার যত্রতত্র পুরস্কারের মর্যাদা পাচ্ছে মিডিয়ায়। অবহেলিত হচ্ছে সৎ ও শক্তিমান সাহিত্য।

বাল্মিকী, ব্যাস, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথের মতো হোমার, ভার্জিল, দান্তে কি শেকসপিয়রের অথবা টলস্টয়, গোর্কির মতো প্রতিভার সৃজনের মূলে সৃজনশীলতার যে উৎকর্ষ, কালোত্তীর্ণ হওয়ার মতো প্রতিভা কোন্ মুদ্রণযন্ত্র, বা ইদানীংকালের 'নেটের ওপর নির্ভরশীল নয়। ফলত উপরোক্ত প্রতিভার সমকক্ষ কোনো দ্বিতীয় আজও অজ্ঞাত থেকে গেছে। বাংলা সাহিত্যে ও কবিতায় রবীন্দ্রোত্তর পর্বে জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র বলতে যে ঘরানার প্রসঙ্গ উঠে আসে সেখানে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও আরও একজন কবি, যাঁর নাম শুনে চমক লাগতে পারে। তিনি তেমনভাবে আলোচিত না হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কবি হলেন বিরাম মুখোপাধ্যায়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতায় যাঁর কবিতাকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও স্থান দিয়েছেন। ষাটের কবি মৃত্যুঞ্জয় সেন যে কবিকে অন্তর্ভুক্ত

করে তাঁর সম্পাদিত বাংলা কবিতা সংকলনের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। বিরাম মুখোপাধ্যায় এমনই এক ব্যক্তিত্ব যাঁকে গ্রহণ করেছিল এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে অধুনা আকাশবাণী, যাঁর সান্নিধ্য চেয়ে ছুটে আসতেন বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, কেতকী কুশারী ডাইসন, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রমুখ তিরিশ থেকে ষাট দশকের কবি-ব্যক্তিত্বেরা। আমার কর্মজীবনে কোনো এক পর্যায়ে কলকাতায় অফিস করার সময় তাঁর সঙ্গে পরিচয় ও যোগাযোগ সৃষ্ট হয়েছিল। তখন তিনি 'নাভানা' নামে তৎকালীন বিখ্যাত প্রকাশনীর কর্ণধার। ছোটোবড়ো নানা পত্র-পত্রিকার লেখালিখি করার সুবাদে আকস্মিকভাবে ইচ্ছা হয়েছিল পত্র-পত্রিকায় ইতিমধ্যে প্রকাশিত ছোটোগল্প নিয়ে একটা সংকলন প্রকাশ করি এবং সেটি সম্ভব হলে 'নাভানা' থেকে যদি হয়। একটা সুযোগ এসেছিল। স্কটিশচার্চ কলেজে পড়ার সময় সহপাঠী কল্যাণ রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। মনে পড়ে, ছাত্র ইউনিয়নের অন্যতম প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় আমার মতামতের অপেক্ষা না করে বন্ধু বান্ধবেরা আমার নাম একটি হ্যান্ডবিলে ছেপে বার করেছিল। তখন আমি তৃতীয় বর্ষ রসায়ন শাখায় অনার্স নিয়ে পড়ি। চমৎকারভাবে রঙিন কালিতে ছাপা সেই হ্যান্ডবিলের উদ্যোক্তা ছিল কল্যাণ। ওদেরই প্রেস ছিল 'নাভানা'। 'নাভানা' তখন নামি লেখকের নানান বই প্রকাশ করছে। ঘটনাটা এখানেই সমাপ্তিরেখা টানে, কারণ অধ্যাপক ডক্টর ব্যানার্জির তিরস্কারে অনার্সের পড়াশোনা ছেড়ে রাস্তায় মিছিল করে ইউনিয়ন করা অপরাধ বলে মেনে নিতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে কলকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসে কর্মরত থাকাকালীন কল্যাণের কাকা শ্যামল রায়ের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে এবং তাঁরই কাছে শুনি কল্যাণ বিদেশে 'প্রিন্টিং টেকনোলজি' নিয়ে পড়াশোনা করে 'নাভানা'য় বসছে। অবশ্য ওর বাবা গোপাল রায় ছিলেন হর্তাকর্তা সেখানকার। গল্প সংকলন প্রকাশ করার একদা-বাসনা চাগাড় দিয়ে উঠেছিল বলে, একদিন অফিস থেকে সোজাসুজি 'নাভানা'য় যাই। কল্যাণের দেখা পাই, নানান কথা হয়। সে সময় নাভানায় প্রকাশের কথা উঠতে কল্যাণ বলে ওর বাবার সঙ্গেই দেখা করতে। এও শুনি 'নাভানা'র প্রকাশনা দেখাশোনা করেন বিখ্যাত কবি ও লেখক বিরাম মুখোপাধ্যায়। কল্যাণের বাবার সঙ্গে দেখা করার পর তাঁর নির্দেশমতো বিরাম মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কিঞ্চিত ভীতির সঙ্গে দেখা করি। আলাপচারিতায় আশ্বস্ত হলাম জেনে তিনি আমার কবিতার সঙ্গে পরিচিত। ইতিমধ্যে 'অমৃত', 'চতুরঙ্গ' ও অন্যান্য

পত্র-পত্রিকায় লিখেছি। কিন্তু গল্প পড়েননি। বললেন, কিছু গল্প সুনির্বাচিত করে তাঁকে দিতে। আরও কিছু পরে নির্বাচিত একটি গল্প সংকলন 'নীলকণ্ঠের কান্না' তাঁকে দিয়ে আসি। বেশ কিছুকাল পরে, অন্তত মাসখানেক যেতে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। ভাবতে পারিনি আমার ভিন্ন মেরুর কাহিনিগুলি তাঁকে গভীরভাবে টানবে। বললেন, কবিতা ভালোই লেখেন, কিন্তু আপনার গল্পের হাত খুব জোরালো, লিখুন, আরও লিখুন। আমার ব্যক্তিগত অনেক তথ্য নিলেন এবং বললেন, এ বই আমি ছাপাব 'নাভানা' থেকে।

বই ছাপা হল। 'দেশ' পত্রিকার প্রথম বিজ্ঞাপনী পাতায় বড়ো অক্ষরে 'নীলকণ্ঠের কান্না' বিজ্ঞাপিত দেখে অনেকেই চমকে গেলেন। পরে বিরাম-দার কাছে শুনেছি আনন্দবাজার পত্রিকার এক নামি লেখক (নামটা করছি না) তাঁকে ফোনে বলেছিলেন, বিরামদা আপনাকে আমার গল্প সংকলনের কথা বলেছিলাম, দেখলাম 'কে এক' (মতি মুখোপাধ্যায়ের গল্পের বই প্রকাশ করেছেন। আমি কি তাঁর থেকে খারাপ লিখি? বিরাম দা খুবই রাগ করেছিলেন' কে এক) নামে অবজ্ঞা সূচক ও ঈর্ষাকাতর শব্দ-বন্ধ ব্যবহার করার জন্য। কটূক্তি করেছিলেন তাঁকে। সেই উক্তি উহ্য থাক।

ফিরে যাই বিরাম মুখোপাধ্যায়ে। প্রথম দর্শনে তাঁকে শারীরিক ও মানসিক উভয়ত পাইন বৃক্ষের মতো ঋজু ও দীর্ঘ, ব্রাহ্মণ্যতেজে দীপ্তিমান, প্রতিভাদীপ্ত উজ্জ্বল দৃষ্টি, মেধায় ও মননে অন্যান্যদের মতো বশ্যতা-না-মানা প্রতীকী এক ব্যক্তিত্ব বলে মনে হয়েছিল। পরে তাঁর বাগুইয়াটির বাসায় যাতায়াতে তাঁকে আরও নিকট থেকে জানা ও বোঝার অবকাশ পেয়েছি। এও মনে হয়েছে তিনি এ যুগের পক্ষে বেমানান। তাঁর কবিতার পাশাপাশি 'প্রকাশনী নৈপুণ্য' এমন এক মাত্রা ছুঁয়েছিল, যা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তথাকথিত খ্যাতিকে অনায়াসে অগ্রাহ্য করতে পারে। 'নাভানা'র পর তিনি সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে 'নবার্ক' নামে প্রকাশনী করেছিলেন, যার লেখক-তালিকা অত্যন্ত ঋদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। কবি ও প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু প্রয়াত হওয়ার পর তাঁর লেখাগুলি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের ইচ্ছায় শ্রদ্ধেয়া প্রতিভা বসু চেয়েছিলেন বিরাম-দার সহায়তা। 'নবার্ক' (ডি সি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, পোঃ দেশবন্ধু নগর কলকাতা- ৫৯) থেকে বুদ্ধদেব বসুর 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ' প্রকাশের সময় মুখবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'বুদ্ধদেব বসু এই পার্থিব জগৎ থেকে বিদায় নেবার পরে এই প্রথম আবার বিরামবাবুর সম্পাদনায় তাঁর বই বেরুচ্ছে। আমার পক্ষে এর চেয়ে আনন্দের বিষয়

আর কিছু নেই। বুদ্ধদেব তাঁর লেখা বিষয়ে যত খুঁতখুঁতে ছিলেন, তার ছাপা কাগজ বানান ইত্যাদি বিষয়েও ততই খুঁতখুঁতে ছিলেন। তাঁর সেই সতর্ক মনোযোগের একমাত্র সঙ্গী ও বন্ধু ছিলেন বিরাম মুখোপাধ্যায়। তাঁর হাতে বই গেলে বলতেন, 'আমার অনেক ভুল হয়, কিন্তু বিরামবাবু? অসম্ভব। বিরামবাবুর চোখ আমার চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক। মানুষ মৃত্যুর পরে কোথায় যায় জানি না, আত্মা নামে সত্যই কিছু আছে কিনা জানি না, যদি থাকে এই প্রকাশ নিশ্চয়ই তাকে তৃপ্ত করবে। বিরামবাবু আমার কাছে তাঁর এই প্রবন্ধ-নির্বাচন সঠিক হয়েছে কিনা জানতে চেয়েছিলেন। বিরামবাবুর নির্বাচনের উপর হাত দেবো এমন স্পর্দ্ধা আমার নেই। এই প্রসঙ্গে জানাই, বিরামদাকে কোনো একটি নামি প্রকাশনী তাদের বইপত্র প্রকাশের কর্ণধার করতে তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন কিন্তু অন্যান্যদের কাছে যা দুর্লভ সুযোগ মনে হতে পারত, বিরামদা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। একদা 'ভারবি' ও 'চতুরঙ্গে'ও তিনি যুক্ত ছিলেন। 'ভারবি'তে থাকাকালীন তাঁর কাছে শোনা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'সোনার মাছি খুন করেছি' তাঁর পছন্দসই প্রকাশনা ছিল। বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসুর মতো কবি-ব্যক্তিত্ব অক্লেশে যাঁর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন তাঁদের রচনা-নির্বাচন ও সংকলনের দায়িত্ব, যাঁর কবিতার প্রতি এত তীব্র ভালোবাসা, বোধের গভীরতা, প্রবল কবিত্ব-শক্তি থাকা সত্ত্বেও কেন যে তিনি এ সময়কার যথার্থ প্রতিনিধি কবি হিসাবে মান্যতা পেলেন না সেটাই বিস্ময়ের।

ঠিক বিস্ময়ের না। নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রে বলা হয়েছে প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে। বিরামদাকে দেখেছি বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে তারা বাণিজ্য বোঝে সাহিত্য জানে না। তুলতুলে সরস লেখায় পাঠকের মন জয় করে। বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকায় লেখার ব্যাপারে আমাকেও ভৎর্সনা করতে ছাড়েননি। দলমত নির্বিশেষে নিজের মতো করে আমি লিখি, কারও মন জোগাতে নয়, তাতেও রেহাই পাইনি। জানি না সঠিক কারণ, তাঁর জেদি মানসিকতার বিপরীত কোনো প্রতিক্রিয়া কখনও ঘটে থাকলেও থাকতে পারে।

তাঁর কবিতার প্রসঙ্গে আসি। আমার সংগ্রহে তাঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থ। জুন, ১৯৮৪তে প্রকাশিত 'তিলফুলে তিলোত্তমা' যা তিনি উৎসর্গ করেছেন তাঁর ঋষিপ্রতিম পিতৃদেব ও সাহিত্যের পথ প্রদর্শক ইন্দীবর কৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ কবি বিনোদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। সুপণ্ডিত পিতার পুত্র বিরাম মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য,

/ আপাতত শিকলি – কাটা টিয়া / তার নিজ চাঁচাছোলা ছোট্ট জবানিতে / একটু কান দিন / ক্লারা জেটকিন।'

বাংলা কবিতার রেকর্ড ভেঙে পরপর দু বছরে প্রকাশিত 'তিলফুলে তিলোত্তমা' ও 'নখে লাল দাঁতে লাল' দুই বাংলার পাঠকদের সুশিক্ষিত সহৃদয়তায় দ্রুত নিঃশেষ হলে বিরাম মুখোপাধ্যায় ডিসেম্বর ১৯৮৭ তে প্রকাশ করেন তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বারো সূর্যের মহড়ায়।' শব্দ, রূপকল্প, মেধাবী মননে দৃপ্ত তীর্যক ব্যঙ্গ নিপুণ 'বারো সূর্যে মহড়ায়' কবিকে পাওয়া যায় একজন প্রতিরোধী সৈনিক হিসাবে।

'অনাথ পিণ্ডদ হবো চক্ষুষ্মান সন্দীপ্ত ইন্দ্রিয়ে, / সপ্তাশ্ব লাগাম ছিঁড়ে অন্ধকূপে অতলা ঝাঁপাবে? / ব্যতিপাতে অভ্যস্ত প্রকৃতি। নিখর্ব বছর পরে, / আহাম্মক, এসো তুমি ত্রিজগৎ মসীময় করে।'

স্বাধীনতার তিক্ত স্বাদ এদেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ও চেতনায়। ক্ষোভ ও হতাশা থেকে উদ্ধারের জন্য স্বদেশ থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়েছে অনেকেই, সেই নৈরাশ্যের ছবি : 'জীবন বিশ্বাসের কড়চা'।

'বেঁচে থেকে শ্মশানচিতায় ছাই ভস্ম মেখে-মেখে। কাঁহাতক পৈতে পোড়া সন্ন্যাসীর ভেক ভালো লাগে? / চিন্তা-ভাবনার কালিমুখে নুড়ো জ্বেলে চলে যাই / দূর-দুর্গমেই পা বাড়াই বায়ুপথ চিরে-চিরে / আবুধাবী গিয়ে ছাই ছেড়ে দৌলতের ঝাঁকামুটে / ডিমপাড়া ডলারের ঠিকাদার সোনাব্যাং হই।'

কবিতার এই মহড়া, সোচ্চার কণ্ঠ, যাবতীয় নষ্টামি ও ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিঘাত— বিরাম মুখোপাধ্যায়ের কবিতার প্রধানতম দিক। মনে পড়ে ভি আই পি রোডের ধারে দেশবন্ধু নগরের সেই বাসা, কতদিন কত কবির সেখানে আনাগোনা। অসুস্থ অবস্থাতেও অজেয় পৌরুষের মতো এক দৃপ্ত চেতনার মানুষ আধশোয়া অবস্থায় ওষুধপত্র ঠেলে রেখে, খাওয়া দাওয়ার সময় ভুলে কেবলি বলছেন বর্তমান সাহিত্যের কথা, কবিতার কথা, নতুন বইয়ের কথা। এমনি অবস্থাতেও 'নবার্ক' থেকে প্রকাশ করেছেন আমার নতুন কবিতার বই : 'প্রতিদিন স্বর্গ ভাঙে প্রতিদিন স্বর্গ গড়ে' যা পুরস্কৃত হয়েছে কয়েকবার। বইটি তাঁকেই উৎসর্গ করা।

একটা মানুষ, সাহিত্যে নিবেদিত প্রাণ, দৃপ্ত তেজস্বী অন্তঃকরণ অথচ নবীন কবিদের প্রতি তীব্র সহানুভূতি এ যুগে দুর্লভ। তাঁর প্রয়াণে এক অপূরণীয় ক্ষতি। কখনও তা কোনোভাবে ভরাট হবে বলে ভাবা যায় না।

/ আপাতত শিকলি – কাটা টিয়া / তার নিজ চাঁচাছোলা ছোট্ট জবানিতে / একটু কান দিন / ক্লারা জেটকিন।'

বাংলা কবিতার রেকর্ড ভেঙে পরপর দু বছরে প্রকাশিত 'তিলফুলে তিলোত্তমা' ও 'নখে লাল দাঁতে লাল' দুই বাংলার পাঠকদের সুশিক্ষিত সহৃদয়তায় দ্রুত নিঃশেষ হলে বিরাম মুখোপাধ্যায় ডিসেম্বর ১৯৮৭ তে প্রকাশ করেন তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বারো সূর্যের মহড়ায়।' শব্দ, রূপকল্প, মেধাবী মননে দৃপ্ত তীর্যক ব্যঙ্গ নিপুণ 'বারো সূর্যে মহড়ায়' কবিকে পাওয়া যায় একজন প্রতিরোধী সৈনিক হিসাবে।

'অনাথ পিণ্ডদ হবো চক্ষুষ্মান সন্দীপ্ত ইন্দ্রিয়ে, / সপ্তাশ্ব লাগাম ছিঁড়ে অন্ধকূপে অতলা ঝাঁপাবে? / ব্যতিপাতে অভ্যস্ত প্রকৃতি। নিখর্ব বছর পরে, / আহাম্মক, এসো তুমি ত্রিজগৎ মসীময় করে।'

স্বাধীনতার তিক্ত স্বাদ এদেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ও চেতনায়। ক্ষোভ ও হতাশা থেকে উদ্ধারের জন্য স্বদেশ থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়েছে অনেকেই, সেই নৈরাশ্যের ছবি : 'জীবন বিশ্বাসের কড়চা'।

'বেঁচে থেকে শ্মশানচিতায় ছাই ভস্ম মেখে-মেখে। কাঁহাতক পৈতে পোড়া সন্ন্যাসীর ভেক ভালো লাগে? / চিন্তা-ভাবনার কালিমুখে নুড়ো জ্বেলে চলে যাই / দূর-দুর্গমেই পা বাড়াই বায়ুপথ চিরে-চিরে / আবুধাবী গিয়ে ছাই ছেড়ে দৌলতের ঝাঁকামুটে / ডিমপাড়া ডলারের ঠিকাদার সোনাব্যাং হই।'

কবিতার এই মহড়া, সোচ্চার কণ্ঠ, যাবতীয় নষ্টামি ও ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিঘাত— বিরাম মুখোপাধ্যায়ের কবিতার প্রধানতম দিক। মনে পড়ে ভি আই পি রোডের ধারে দেশবন্ধু নগরের সেই বাসা, কতদিন কত কবির সেখানে আনাগোনা। অসুস্থ অবস্থাতেও অজেয় পৌরুষের মতো এক দৃপ্ত চেতনার মানুষ আধশোয়া অবস্থায় ওষুধপত্র ঠেলে রেখে, খাওয়া দাওয়ার সময় ভুলে কেবলি বলছেন বর্তমান সাহিত্যের কথা, কবিতার কথা, নতুন বইয়ের কথা। এমনি অবস্থাতেও 'নবার্ক' থেকে প্রকাশ করেছেন আমার নতুন কবিতার বই : 'প্রতিদিন স্বর্গ ভাঙে প্রতিদিন স্বর্গ গড়ে' যা পুরস্কৃত হয়েছে কয়েকবার। বইটি তাঁকেই উৎসর্গ করা।

একটা মানুষ, সাহিত্যে নিবেদিত প্রাণ, দৃপ্ত তেজস্বী অন্তঃকরণ অথচ নবীন কবিদের প্রতি তীব্র সহানুভূতি এ যুগে দুর্লভ। তাঁর প্রয়াণে এক অপূরণীয় ক্ষতি। কখনও তা কোনোভাবে ভরাট হবে বলে ভাবা যায় না।